**ভূমিকা :** বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮–১৮৯৪) বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক। তার লেখার মধ্য দিয়ে বাংলা উপন্যাস প্রথম মুক্তি পায়। 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) তার দ্বিতীয় উপন্যাস। এ উপন্যাস বঙ্কিমের প্রতিভা তার পূর্বেকার সমস্ত সংকোচ, অনিশ্চয়তা, পুরাতন প্রথার সশঙ্ক অনুবর্তন ত্যাগ করে নিজ স্বরূপের পরিচয় পেয়েছে। এ

উপন্যাসের অন্তর্নিহিত ভাবটিতেই রয়েছে অসামান্য মৌলিকতা। রোমান্টিক আবেষ্টন রচনায় তিনি নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। অভিনব ও অনন্য সাধারণ বিষয়, সুন্দর শিল্পশ্রী এবং বর্ণনা ও ভাষাভঙ্গির অপূর্ব কুশলতা উপন্যাসটিকে একটি উজ্জ্বল রসলোকে উত্তীর্ণ করেছে। এ উপন্যাসের বিভিন্ন স্থানে চিত্রকল্প নির্মাণ, উপমা-উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার, শব্দ ব্যবহার ও বাক্য গঠনে নিপুণতা, সংলাপের মধ্যে নাটকীয়তার চমক প্রভৃতির ফলে উপন্যাসটির একটি সর্বজনীন আবেদন রয়েছে।

**'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের কাব্যধর্মী ভাষা :** 'কপালকুণ্ডলা' একখানা কাব্যধর্মী রোমান্টিক উপন্যাস। কবিত্ব এর অঙ্গধর্ম হতে পারে, প্রাণ লক্ষণ নয়। কাব্যধর্মী ভাষা, আবেগের প্রবলতা, প্রাকৃতিক পরিবেশ, প্রেক্ষিত বর্ণনার আধিক্য প্রভৃতি উপাদান উপন্যাসে মুখ্য হয়ে উঠলে তাকে কাব্যধর্মী উপন্যাস বলা যেতে পারে। 'কপালকুণ্ডলা'র প্রকৃতি, পরিবেশের গুরুত্ব, নির্জন বালিয়াড়ি, অরণ্য ও শ্মশান প্রভৃতির ভূমিকা সমাজ সংসার শূন্য প্রাকৃতিক স্বভাববিশিষ্ট রমণী চরিত্রের এক ধরনের রোমান্টিক কল্পনাকে আমন্ত্রণ করেছে।

যেকোনো উপন্যাসের ক্ষেত্রে ভাষারীতি একটি প্রধান ব্যাপার। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের ভাষার শব্দসম্ভারে সমাসবদ্ধ ও সন্ধিযুক্ত ভারীপদের প্রাচুর্য রয়েছে। তবে উপন্যাসে সহজ-সরল শব্দের মিশ্রণ ঘটেছে। বিষয় ও ভাবের বৈচিত্র্য অনুসারে ভাষার রূপান্তরও ঘটানো হয়েছে। তৎসম ও তদ্ভব শব্দের ব্যবহারও হয়েছে প্রচুর পরিমাণে। সংলাপের ভাষা প্রধানত দ্রুতগতির। ক্ষুদ্রবাক্যগুলো সংহত ও নাট্যধর্মী এবং তা প্রায় যথারীতির কাছাকাছি। তবে বড় বাক্যগুলোতে ভাষার ওজন বেশি। এসব সাধারণ লক্ষণ সত্ত্বেও এ উপন্যাসের ভাষা বেশ শিল্পমণ্ডিত।

**'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে যেভাবে কাব্যধর্মী ভাষার আগমন ঘটেছে :** 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে সমুদ্র, নদীমোহনা, অরণ্য, সৈকত, শ্মশান, নবাবী হারেম প্রভৃতি বিচিত্র স্থান ও পরিবেশ বর্ণনায় তিনি যে ভাষারীতির ব্যবহার করেছেন তা অভিনব সৌন্দর্য প্রকাশ করেছে। উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে কুয়াশাচ্ছন্ন জলপথে দিক ভুলে যাওয়া নৌকার যে বর্ণনা রয়েছে তা দু'চার লাইনে সীমাবদ্ধ, "রাত্রি শেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল।" আবার, "চতুর্দিকে অতি গাঢ় কুজ্ঝটিকায় ব্যাপ্ত হইয়াছে, আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, উপকূল কোনো দিকে কিছুই দেখা যাইতেছে না।" এছাড়া নবকুমারের সাথে ঘনঅরণ্যের কপালকুণ্ডলার দেখার প্রথম সংলাপটিতেও লেখক কাব্যিকসুরের মায়াজাল বিস্তার করেছেন : "পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?" এ-সংলাপে পাঠক যেমন বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে– তেমনি নবকুমার অকস্মাৎ বনের মধ্যে দুর্গম পরিবেশে দেবীমূর্তি দেখে বাকশূন্য হলেন। রমণীও সেই মুহূর্তে স্পন্দনহীন। বিশাল দুটি চোখ নবকুমারের মুখের উপর স্থির হয়ে রইল। সেই অসম সমুদ্রের জনহীন তীরে দাঁড়িয়ে সহসা দু'জনের মুখে কোনো শব্দ এলো না। তার কণ্ঠস্বর নবকুমারের কাছে সঙ্গীতের মতো ছন্দময় মনে হতে লাগল।

প্রথম অধ্যায়ে নদীমোহনার চিত্র অঙ্কনে সরল, জটিল ও বিভিন্ন উপমার সংমিশ্রণে ভাষাটি চমকপ্রদ করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে নবকুমারের আকস্মিক সমুদ্র দর্শনে লেখক আশিটির বেশি বাক্য ব্যবহার করে প্রকৃতির বর্ণনাকে বিস্তৃত করেছেন। এ অংশে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ হলো অনন্তবিস্তার, নীলাম্বুমণ্ডল প্রভৃতি। এসব শব্দের সাহায্যে তিনি সমুদ্রের বিশাল রূপটিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এসব সংস্কৃত শব্দের ঝংকার উপন্যাসে একটি আবেদন এনেছে যা একই সাথে গম্ভীর ও সর্বগ্রাসী। উপন্যাসের এ অংশে আবার অলংকারের বাহুল্য রয়েছে। কখনো তা রূপ সাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে, "নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল।" উপন্যাসে শ্মশানের দুটি বর্ণনায় তিনি বিভিন্ন শব্দের ব্যঞ্জনা দিয়ে ভীতি ও ভয়ঙ্করতার বোধ মুদ্রিত করেছেন। এসব জায়গায় তাঁর শব্দ চেতনা খুবই তীব্র। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের প্রায় সব জায়গায় ঘটনার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করেছেন। ফলে হেতুবাচক অব্যয়ের প্রাধান্য উপন্যাসে রয়েছে, যেমন– যেহেতু, সেহেতু, তাই, সুতরাং, সেজন্য ইত্যাদি।

**'কপালকুণ্ডলা' ও 'মতিবিবির' রূপ বর্ণনায় কাব্যধর্মী ভাষা :** উপন্যাসের প্রধান দুটি নারী চরিত্র হলো কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবি ওরফে পদ্মাবতী। এদের রূপ ও চরিত্র চিত্রণে লেখক অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এদের রূপ ও চরিত্র চিত্রণে তিনি নানা সরল ও জটিল বাক্য ব্যবহার করে তাদের স্পষ্ট করে তুলেছেন। কপালকুণ্ডলার রূপচিত্রণে তিনি প্রায় ১০০ শব্দ ব্যবহার করেছেন। তৎসম শব্দ ও নানা বাক্যের সংমিশ্রণে তার রূপের একটি তরঙ্গায়িত আবেদন সৃষ্টি হয়েছে– যার মধ্যে ফুটে উঠেছে কাব্যিক ভাষার সৌন্দর্য। যেমন :

"সেই গম্ভীরনাদিবারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণী-মূর্ত্তি! কেশভার-অবেণীসংবদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত আগুল্‌ফ-লম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না- তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ, অতি স্থির, অতিস্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর অথচ জ্যোতির্ময়; সে কটাক্ষ, এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল

চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য; বাহুযুগলের বিমল শ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। রমণীদেহ একেবারে নিরাভরণ। মূর্ত্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্দ্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদীবর্ণ; ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল; পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকশিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে, সন্ধ্যালোকে না দেখিলে, তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।"

কপালকুণ্ডলার অনিন্দ্য সুন্দর রূপ মাধুর্যে ভেসে গেছে নবকুমারের হৃদয় মন। তার রূপ নবকুমারকে করেছিল মুগ্ধ। আর এ কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের এই-মুগ্ধতা উপন্যাসের শেষ পর্যন্তও বজায় ছিল। যেমন উপন্যাসের পরিণতিতে যখন কপালকুণ্ডলাকে বলি দেওয়ার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল– তখনও লেখক নবকুমারের মুখ থেকে উচ্চারণ করিয়েছেন। "তুমি কি জানিবে মৃন্ময়ী, তুমি ত কখনো রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হও নাই।"

শুধু নবকুমার নয়– নারীর চোখেও ধরা পড়েছে সৌন্দর্যের মনোহরণকারী দৃশ্য। মতিবিবি কপালকুণ্ডলার সাথে দেখা করতে গিয়ে, তার নিজের গায়ের সব অলঙ্কার একে একে খুলে কপালকুণ্ডলাকে পরাতে থাকেন। সৌন্দর্যপিপাসু মতিবিবি প্রকৃতি লালিত কপালকুণ্ডলার রূপমাধুর্যে সত্যিই যে মুগ্ধ আর তার মুগ্ধ চৈতন্যের অভিব্যক্তি : "আপনি সত্যিই বলিয়াছিলেন। এ ফুল রাজোদ্যানেও ফোটে না।"

অন্যদিকে মতিবিবির রূপবর্ণনাতেও লেখক কাব্যিক ভাষার ব্যবহার দেখিয়েছেন। ঔপন্যাসিকের ভাষ্য–

"যেন সে নয়ন মন্মথের স্বপ্নশয্যা। কখনো বা লালসাবিস্ফারিত, মদন রসে টলায়মান।... রূপরাশিতরঙ্গে, তাঁহার যৌবনশোভা শ্রাবণের নদীর ন্যায় উছলিয়া পড়িতেছিল।"

মতিবিবি চরিত্রের বুদ্ধিদীপ্ততা প্রকাশ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে অসাধারণ রূপ মাধুর্য ফুটিয়ে তুলেছেন তা সত্যিই দুর্লভ। লেখকের ভাষায়– "মুখকান্তি মধ্যে দুটি অনির্বচনীয় শোভা, প্রথম সর্বত্রগামিনী বুদ্ধির প্রভাব, দ্বিতীয় আত্মগরিমা। তৎ কারণে যখন তিনি মরাল গ্রিক বঙ্কিম করিয়া দাঁড়াইতেছেন, তখন সহজেই বোধ হইত, তিনি রমণীকুলরাজ্ঞী।"

এছাড়া কথাটি মেহেরুন্নেসা মতিবিবির কথার কাব্যিকতার ছোঁয়া আছে। ভারতবর্ষের অধিপতি যুবরাজ সেলিম সম্পর্কে কথোপকথনের সময় মেহেরুন্নেসা সেলিমের প্রতি ভালোবাসার গুরুত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছে : "কাহাকে বিস্মৃত হইব? আত্মজীবন বিস্মৃত হইব, তথাপি যুবরাজকে বিস্মৃত হইতে পারিব না।" মতিবিবি কৌশলে সেলিমের প্রতি তার ভালোবাসার গাঢ়ত্ব জানতে চাইলে মেহেরুন্নেসা আরো বলে : "মেহেরুন্নেসা হৃদয় মধ্যে তাঁহার ধ্যান করিবে। প্রয়োজন হইলে তাঁহার জন্য আত্মপ্রাণ পর্যন্ত সমর্পণ করিবে।"

**বিভিন্নজনের সাথে মতিবিবির কথোপকথনে কাব্যিকতার সুর :** মেহেরুন্নেসার মনোভাব জানতে পদ্মাবতী বর্ধমানে গিয়ে জানতে পারে আকবর বাদশাহের মৃত্যু হয়েছে এবং সেলিম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। মেহেরুন্নেসার সাথে আলাপ করে বুঝলো সেলিমকে সে কখনো ভুলতে পারবে না। উভয়ে সেলিমের অনুরাগী– পদ্মাবতীর অভিমত– 'এক মৃণালে দুটি কমল ফুটিতে পারে না।'-এখানেও স্পষ্টত প্রকাশ পেয়েছে কাব্যিকতার সুর।

পদ্মাবতী সপ্তগ্রামে এসে নবকুমারকে প্রেম নিবেদন করলে সে প্রত্যাখিত হয়। এর ফলে তার মধ্যে যে আত্মাভিমান ছিল তা আবার ঝড়ের গতিতে জেগে উঠল। নবকুমার তার আশা পরিত্যাগ করে আগ্রাতে পদ্মাবতীকে ফিরে যেতে বললে তার যে প্রতিক্রিয়া হয় তা ঔপন্যাসিক চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। যেমন–

"স্রোতবিহারিণী রাজহংসী যেমন গতিরোধীর প্রতি গ্রীবাভঙ্গি করিয়া দাঁড়ায়, দলিত ফণা যেমন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনি উন্মাদিনী যবনী মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন 'এ জন্মে না। তুমি আমারই হইবে।"

**উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতেও কাব্যিকতার ছোঁয়া :** রোমান্টিকতার আরেক বৈশিষ্ট্য হাহাকার এবং অন্তর্বেদনা– তা আমরা এ উপন্যাসের শেষে গিয়েও দেখতে পাই– আর এই রোমান্টিকতা প্রকাশ করতে গিয়ে লেখক আশ্রয় করেছেন কাব্যধর্মী ভাষাকে। পদ্মাবতী কপালকুণ্ডলাকে বলেছে নবকুমারকে ত্যাগ করতে। এর পরিপ্রেক্ষিতে কপালকুণ্ডলার মনের শূন্যতাকে প্রকাশ করেছেন এভাবে : "পৃথিবীর সর্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অন্তঃকরণমধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন– তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না।"

**উপসংহার :** পরিশেষে বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে রোমান্টিকতায় আবহসৃষ্টি করতে গিয়ে ভাষাকে পৌঁছে দিয়েছেন কাব্যধর্মী-ভাষার কাছে। শব্দ নির্মাণ ও প্রয়োগে তিনি সর্বদা সতর্ক ছিলেন। ফলে উপন্যাসের ভাষা এমন একটি সাবলীল গতি ও সার্থকতা অর্জন করেছে, যা অতি সহজ ও সূক্ষ্ম স্পর্শে গভীর আবেদন সৃষ্টি করেছে। অরণ্য-সমুদ্র-বিজনপ্রান্তর, নারী চরিত্রগুলোর রূপ বর্ণনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ-জাতীয় ভাষার বহুবিধ ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তাই বলা যায় 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের ভাষা কাব্যধর্মী।